পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নারীর ভূমিকা এবং আইন ও নীতি

ইমতিয়াজ আহমেদ সজল

পরিবেশ সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা

আদিকাল থেকে এ দেশে নারীকে প্রকৃতির সংরক্ষণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ দেশের বেশির ভাগ মানুষই প্রকৃতির সহায়তায় জীবিকা নির্বাহ করে। চাষাবাদ, গবাদিপশু প্রতিপালন, উন্মুক্ত জলাশয় থেকে মাছ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় সমান। কখনো কখনো নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অনেকাংশে বেশি। বীজ সংগ্রহ, শস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পারিবারিক পুষ্টির সরবরাহ, পানীয় জল সংগ্রহ— এ সবই নারীর প্রাথমিক দায়িত্ব। এ কাজগুলোর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের কাজটা নারী করে থাকে কোনোরকম পারিশ্রমিক ছাড়াই। একজন নারী তার সহজাত প্রকৃতির কারণেই পরিবেশ সংরক্ষণে উৎসাহী। নারীরা ধ্বংস করে না বরং গড়ে। প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে প্রায় সকল নারীই বিশ্বের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নারীই প্রথম জানিয়েছে বীজ থেকে বৃক্ষজন্মের প্রক্রিয়া। নারী তার সঞ্চিত জ্ঞান থেকেই বীজ বপনের মধ্য দিয়ে বনায়ন কর্মসূচিকে সফল করে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছিল এ পৃথিবীতে।

১৯৭০-'৭১— এ সময়ের মধ্যে পরিবেশ নারীবাদ (Ecofeminism) বিষয়টি নারী ও পরিবেশ ভাবনায় একটি মজবুত অবস্থান তৈরি করে নেয়। মাতৃতান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজ পদ্ধতিতে পরিবেশ ছিল সংরক্ষিত ও অক্ষত, কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অবসানের সাথে সাথে শুরু হয় পরিবেশের ওপর অন্যায় ও অবিচার। ফলাফল হিসেবে আজ আমরা বসবাস করছি এক উত্তপ্ত পৃথিবীতে। এ দেশের নারীদের একটা বিশাল অংশ কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। প্রায় ১২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নারীরা পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বীজ সংগ্রহ করে আসছে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন রকম জেনেটিক্যালি মডিফাইড ও হাইব্রিড বীজের উপর্যুপরি ব্যবহারের ফলে ব্যাপক হারে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হচ্ছে এবং বিনষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ দেশের নারীরা গড়েছে 'নয়া কৃষি আন্দোলন' যার দ্বারা তারা সমৃদ্ধ করছে বীজ ভাণ্ডার, ব্যবহার করছে জৈবসার।

পরিবেশ বিপর্যয়ে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের মতো প্রাকৃতিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশে নারীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। যেকোনো দুর্যোগে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী। তবু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসনে নারীর ভূমিকা ও

প্রয়োজন উপেক্ষিত। যেকোনো ঘূর্ণিঝড় বা প্রলয়ংকরী বন্যায় সর্বস্ব হারানো নারীর অসহায়ত্ব কল্পনাতীত। রাষ্ট্রীয় সহায়তার অভাবে খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, জীবিকা সব মৌলিক দাবিই তার কাছে হয়ে পড়ে অর্থহীন। এখানে আইলা ও সিডরের কথা উল্লেখ করা যায়। এ দুটি দুর্যোগে যত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তার বেশির ভাগই ছিল নারী। এখানেই শেষ নয়, যারা বেঁচে থেকেছে তাদের সহ্য করতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট। এ সময় নারীদের সাঁতরে খাবার পানি সংগ্রহ করতে দেখা গিয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়েছে। তারা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়েছে মানবেতর অবস্থায়।

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে নারীর কথা বলা হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরুঅঞ্চল ও হিমালয়ের বরফ গলতে শুরু করেছে। ফলাফল হিসেবে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো : ক. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে, দেশের উপকূলবর্তী নিচু এলাকা প্লাবিত হবে, নোনাপানির অনুপ্রবেশে কৃষিক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে অরক্ষিত (Most vulnerable) হয়ে পড়বে। খ. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে, জীবন-জীবিকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে, সেই সাথে হুমকির মুখে পড়বে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য।

এসব পরিস্থিতিতেও নারী ও শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। পুরুষনির্ভর সমাজের ধারাবাহিক ও অন্তহীন ভোগপ্রবণতা পরিবেশ বিপর্যয় আর জলবায়ু পরিবর্তনের সীমারেখাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, যার দীর্ঘমেয়াদি ও সুদূরপ্রসারী কুফল নারীকে তার জীবনব্যাপী বহন করতে হবে। এ জাতীয় বিপর্যয়ের ফলে নারী উৎপাদনশীল জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভয়াবহ অবক্ষয়, মরুকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার দায়ভার এসে পড়ে নারীর ওপর, যা তার খাদ্য, জ্বালানি ও বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহের কাজকে আরো কষ্টসাধ্য করে দিচ্ছে। এ দেশের গ্রামীণ নারীরা তাদের জীবন-জীবিকার জন্য পরোপুরিই প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। সে কারণেই পরিবেশের বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নারীদের ওপরই বেশি।

পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণে আইন ও নীতি

নারী পরিবেশের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে, কেননা পুরুষের তুলনায় নারীরাই প্রকৃতির নিকটে অবস্থান করে। তাই প্রকৃতির সাথে নারীর সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রণীত বিভিন্ন আইন ও নীতিতে এ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে বারংবার। এখানে আমরা দেখব তারই কিছু দৃষ্টান্ত :

- **পরিবেশ এবং উন্নয়ন-সম্পর্কিত রিও ঘোষণা ১৯৯২** : জাতিসংঘের পরিবেশ এবং উন্নয়ন সম্মেলন (UNCED) ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিশ্বনেতারা যে ঘোষণা দেন তার ২০ নম্বর নীতিতে বলা হয়, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

- **দীর্ঘস্থায়ী জৈব রাসায়নিক (POPs) ক্ষতিকর পদার্থ-সংক্রান্ত স্টকহোম কনভেনশন ২০০১ :** এ কনভেনশনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে POPs-এর সংস্পর্শজনিত কারণে বিশেষত নারী এবং তাদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অনুচ্ছেদ ১০(গ)-তে বলা হয়েছে, POPs-সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষত নারী, শিশু ও কম শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাগত ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সাথে তাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এসব রাসায়নিকের ফলাফল ও সেগুলোর বিকল্পও কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

- **জীববৈচিত্র্য কনভেনশন ১৯৯২ :** এ কনভেনশনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ততা ও প্রকৃতি-নির্ভরতাভিত্তিক সনাতনী জীবনধারাকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর উপাদানগুলোর টেকসই ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত সনাতনী জ্ঞান আবিষ্কার ও চর্চার ফলে যে সুবিধার সৃষ্টি হবে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করে নেয়ার ইচ্ছাকে স্বীকার করে নিয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও এর টেকসই ব্যবহারে নারীসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে নিয়ে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের সব স্তরে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়ে এ কনভেনশন গৃহীত হলো।

- **মরুকরণ মোকাবেলায় জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৯৪ :** এ কনভেনশনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, মরুকরণ ও খরার ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চলগুলো বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ এলাকায় মরুকরণ মোকাবেলায় নারীদের ভূমিকাকে বিবেচনায় নিয়ে সকল পর্যায়ে সব ধরনের কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৫(ঘ) ও ১০-এ বলা হয়েছে, পক্ষ রাষ্ট্রসমূহ মরুকরণ মোকাবেলায় ও খরা হ্রাসে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সকল কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বাধ্য।

- **১৯৯৫ সালের বেইজিং চতুর্থ নারী সম্মেলন :** এ সম্মেলনে পরিবেশগত সিদ্ধান্তের সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বেশ কিছু কৌশলগত লক্ষ্য ঠিক করা হয়, যার অন্যতম : ক. পরিবেশগত সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা; খ. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; গ. টেকসই নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচিতে জেন্ডারসমতা নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার পরিবেশ বিপর্যয় ও তার ফলে নারীর ওপর সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া রোধে সকলকে উৎসাহিত করা; ঘ. নারীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কাজে লাগানো।

বিশ্বজুড়ে পরিবেশগত ন্যায়বিচার সুরক্ষায় নারীর অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এ দেশের সংবিধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, বননীতি ১৯৯৪, খাদ্যনীতি ২০০৬, পানিনীতি ১৯৯৯, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নারী ও পরিবেশের সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

- **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ :** অনুচ্ছেদ ১৯(৩)-এ বলা হয়েছে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন; অনুচ্ছেদ ২৮(১)-এ বলা হয়েছে, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না; অনুচ্ছেদ ২৮(২)-এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন; অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এ বলা হয়েছে, নারী বা শিশুদের অনুকূলে বা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ :** সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য বা ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষত বয়োঃবৃদ্ধ, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ও ঝুঁকি হ্রাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। [ধারা ২৭ (১)]

- **সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ :** এ বিধিমালায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক সামাজিক বনায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, বন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং আবেদনকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা থাকিবেন, সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সামাজিক বনায়নে উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবে (বিধি ৫ক)। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সামাজিক বনায়ন এলাকায় সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সামাজিক বনায়ন এলাকার উপকারভোগীগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, তবে তাহাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মহিলাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। আর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্তত দুইজন মহিলা থাকিবেন (বিধি ৯)।

- **বননীতি ১৯৯৪ :** বননীতির পূর্বশর্ত ৩-এ বলা হয়েছে, বন খাতের উন্নয়নে বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মহিলাসহ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৃক্ষচাষি বন ব্যবহারকারী এবং যাহাদের জীবিকা বন ও বনভূমির উপর নির্ভরশীল তাহাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে। বননীতি ১৯৯৪-এর ঘোষণা ২২-এ বলা হয়েছে, গৃহাঙ্গন ও খামারভিত্তিক গ্রামীণ বনায়ন এবং অংশীদারিত্বভিত্তিক বনায়ন কার্যক্রমে মহিলাদের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হইবে।

- **মৎস্যনীতি ১৯৯৮** : মৎস্যনীতির ৬.৩ নম্বর নীতিতে বলা হয়েছে, মৎস্যচাষে মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হইবে এবং ৬.৪.১ নম্বর নীতিতে বলা হয়েছে, সরকারি খাস দীঘি, পুকুর কিংবা অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিত্তহীন প্রান্তিক চাষি ও গরিব মৎস্যচাষি, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবক/যুব মহিলা ও লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে

ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হইবে। দরপত্রলব্ধ আয়ের অর্থ নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে সরকারি খাতে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হইবে।

- **জাতীয় পানিনীতি ১৯৯৯ :** পানিনীতির ৩খ নম্বর উদ্দেশ্য দরিদ্র ও অনগ্রসর অংশসহ সমাজের সবার জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নারী ও শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দেয়া। এ নীতিমালার নীতি ৪.৫ঙ-এ বলা হয়েছে, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারী এবং নিম্নআয়ের পানি ব্যবহারকারীদের স্বার্থ পর্যাপ্তভাবে সংরক্ষণ করা।

- **জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০০৪ :** এ কর্মপরিকল্পনার ৪.২ নম্বর পরিকল্পনায় জেন্ডার ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রথাগতভাবে নারীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১২০০ বছর আগে থেকেই বীজ বাছাই, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে নারীরা পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেছে। নারীরাই প্রথম গ্রামীণ বনায়নের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। তাই প্রথাগতভাবেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নারীরা জ্ঞানসমৃদ্ধ। অধিকন্তু পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। তা ছাড়া, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা হতে পারে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ও টেকসই পদক্ষেপ, এ উপলব্ধি থেকেই বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) এ নীতি সংযোজনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

- **বনাঞ্চল সহ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২০০৯ :** বনাঞ্চল সহ-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের (প্রজ্ঞাপননং-পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ/১০৫/স্টিং/২০০৬/৩৯৮) অনুচ্ছেদ ২.১-এ বলা হয়েছে, সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে সর্বোচ্চ ৬৫ জন সদস্য থাকবে। তার মধ্যে ন্যূনতম ১৫ জন মহিলা সদস্য থাকবেন। অনুচ্ছেদ ৩.০-এ বলা হয়েছে, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির (Co-management Committee) সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম ৫ জন মহিলা সদস্য থাকবে।

- **Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009 :** এ কর্মপরিকল্পনার ছয়টি থিমের প্রথম থিমে বলা হয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, যাতে দরিদ্রতম এবং নারী ও শিশুসহ সমাজের সবচেয়ে দুস্থ লোকজন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকে। এ থিমের আওতায় প্রস্তাবিত সকল কর্মসূচিতে এই জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ গৃহায়ণ, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যসহ মৌলিক সেবাসমূহ পাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

- **নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ :** এ নীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণ ও তার মতামত প্রতিফলনে সমান সুযোগ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। নদীভাঙন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু ও বন ব্যবস্থাপনায় নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির কথাও বলা আছে এতে।

- **Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan 2013 :** এ কর্মপরিকল্পনার প্রেক্ষাপট হিসেবে বলা হয়, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক ঝুঁকির

মধ্যে যে দেশগুলো রয়েছে, বাংলাদেশের স্থান তাদের শীর্ষে। আবার নানা আর্থ-সামাজিক কারণে এ দেশেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বিপদাপন্ন নারী জনগোষ্ঠী। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবের প্রাথমিক শিকার হিসেবে নারীই পারে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (Adaptation) ও প্রশমনে (Mitigation) কার্যকর ভূমিকা রাখতে। এ কর্মপরিকল্পনাটি গ্রহণের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট যেকোনো নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে জেন্ডারসমতা নিশ্চিত করা। এ কর্মপরিকল্পনায় ২০০৯ সালে গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনার ছয়টি থিমের মধ্যে চারটি থিমের (খাদ্য, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা; সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং প্রশমন; ও স্বল্প কার্বন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ) অধীনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের বিস্তারিত রূপরেখা বলে দেয়া হয়েছে এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ চারটি ক্ষেত্রে নারীর অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়।

সৃষ্টির আদি থেকে পরিবেশের সাথে নারীর যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর যে অপরিহার্য ভূমিকা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আজ তা উপেক্ষিত। পুরুষতন্ত্র যেভাবে নারীর শ্রমশক্তি, প্রজনন, গতিশীলতা ও সম্পদ-সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে শোষণ করছে, ঠিক তেমনি প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এর যথেচ্ছ ব্যবহারে উদ্যত হয়েছে। এ পর্যায়ে এসে পরিবেশ-প্রকৃতির সাথে নারী একাকার। এখন আর এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক পরিবেশের এ বিপর্যয় রেধে একমাত্র পথ হলো নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিবেশ সমস্যার সমাধান ও কৌশল খুঁজে বের করা। পরিবেশ নারীবাদীদের মতে, নারীই হলো পরিবেশের প্রধান সংরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আর পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান ভুক্তভোগী। তাই টেকসই উন্নয়নের স্বার্থেই পরিবেশ সংরক্ষণে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নারীদের সম্পৃক্ত করা একান্ত অপরিহার্য।

ইমতিয়াজ আহমেদ সজল শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। imtiazahmadsajal@gmail.com